“গীতারত্ন” শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৪ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রিত রূপে প্রকাশনাঃ জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০/অন্তর্জাল প্রকাশনাঃ এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৪৪তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ / 24.11.2023

-:- সম্পাদক -:-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

ভারতের প্রাণ	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
পরমহংস দয়ালবাবার অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী হলেন ভক্তিবাদী	ডঃ রুহিদাস সাহা
স্বামী নিগমানন্দ	শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ
তৃণাদপি সুনীচেন	শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত
যদি তুমি থাক	শ্রীলা মৈত্র
হাঁটতে হাঁটতে একদিন	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

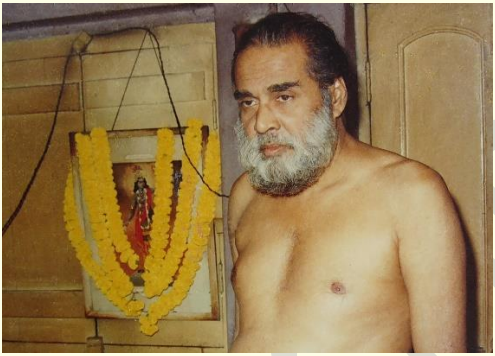

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

ভারতের প্রাণ **শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ**

যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, হয় অধর্মের অভ্যুত্থান, তখন তখনই তিনি নিজেকে সৃজন করেন, অব্যক্ত তিনি ব্যক্তিরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করেন।

আজ আমরা অধিকাংশ দেশবাসী বিষ খেতে ভালবাসছি, অমৃত ত্যাগ করে মরণের পথে, ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছি। কোথায় চলেছি তা' আমরা জানিনা, বুঝিনা। পরানুকরণপ্রিয়তাই এখন আমাদের নিলয়ের পথে, নিরয়ের পথে নিয়ে চলেছে।

আজ আমরা সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি তাঁর জন্য।

তিনি আসবেনই। আসতে তাঁকে হবেই। কিন্তু কিভাবে, কোন মূর্তিতে – তা' আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি আসবেনই। তিনি যে জগতের ত্রাণকর্তা। ভারতের প্রাণ।

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

আজ ১৯৯১ সনের ১৭ই জানুয়ারি। আজ কুয়েতকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও ইরাকের যুদ্ধ ঘোষণার দিন। এ দিন আমায় শ্রীপ্রীতিকুমারকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে।

তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিলো ৩৫ বছর আগে। তার মধ্যে দু-চার বার যুদ্ধ হয়েছে বিশ্বের কোথাও না কোথাও। ভারতবর্ষেও ঘটেছে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ। আমাদের জীবন এই সব যুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হত। দিবারাত্র রেডিও চলতো। চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় টি.ভি.-র মাধ্যমে সংবাদ সরবরাহ হত না এখনকার মত। বাড়িতে আমাদের কথা বলা বন্ধ হয়ে যেত। যাঁরা আসতেন শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে, অবিরত তাঁদের সঙ্গে বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হত। যেহেতু তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন তাঁকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতেন কে জিতবে, কি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। As if তিনি নিজে সমরাধিপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আমি তো রাজনীতি সম্বন্ধে চিরদিনই অনভিজ্ঞ। কিছুই বুঝতাম না। শুধু এটুকু বুঝতাম আমাকে দশ মিনিট অন্তর চা পরিবেশন করতে হবে। রেডিওতে হাত দেবার উপায় ছিল না। তিনি খবর শুনবেন। খবরের কাগজটা একটু পড়বার জন্য ছটফট করতাম, কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমার নাকে চশমা এঁটে খবরের কাগজটিতে চোখ দিয়ে থাকতেন। শুধু একটি কাগজ নয়, ইংরাজী, বাংলা, বিভিন্ন সংবাদপত্র তখন কেনা চাই-ই। কাগজওয়ালা একটু দেরি করলে ভীষণ অসন্তুষ্ট হতেন। তখন দু-তিনজন কাগজওয়ালা নিযুক্ত হতেন। তখন যদি আমরা কেউ কথা বলি, মহা গণ্ডগোল হয়ে যেত। তখন বাড়িতে হৈ হৈ করার মতো আমিই ছিলাম। বাপী ছোট। আমাকে পা টিপে টিপে চলতে হত, কম কথা বলতে হত। যেন একটু এদিক ওদিক হলে বোমাটা আমার বাড়িতেই পড়বে।

আজ বাড়ি ফিরে আমিই তাড়াতাড়ি টি.ভি. চালালাম। একেই বলে গুণীজনের সঙ্গ লাভ। আমার মনে হল টিভি-টা না চালালে শ্রীপ্রীতিকুমার যুদ্ধের

খবর শুনতে পাবেন না। শ্রীপ্রীতিকুমার সশরীরে থাকতে আমি যা বুঝতে চাইতাম না, আজ আমি সেগুলি বোঝবার চেষ্টা করি এটাই আমাদের জীবনের চরম Tragedy. কবির ভাষায় –

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না। .....
আর এই না পাবার যন্ত্রনায় আমরা ছটফট করে মরি।

কি ক্ষতি হত যদি একটু সান্নিধ্য চাইতাম? কি ক্ষতি হত যদি দু' দণ্ড কাছে বসতাম? কি ক্ষতি হত যদি একটু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিয়ে কিছু জানতে চাইতাম? হয় নি, আমার কিছুই পাওয়া হয় নি! এই জনসেবার জন্য আমি দূরে সরে গেছি। আজ কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমার আমার ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার কেন্দ্র। আমি মোটামুটি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে নিরাশ করেন না। আমার কর্মফল খণ্ডাবার ক্ষমতা তো কারো নেই। যা কিছু ঘটেছে আমার কর্মফল বলেই মেনে নিই। কারণ ঐ বাড়ির যা কিছু অনাসৃষ্টি, সব আমার সৃষ্ট। খাল কেটে কেটে কুমীর আমিই ঢুকিয়েছি। শ্রীপ্রীতিকুমার এক একটি পরিবারকে বাড়িতে এনে আমার সাথে আলাপ করিয়ে দিতেন, ক্রমে ক্রমে আমি তাদের ভালবেসে আকুল হয়ে উঠেছি। ফলে এক একটি পরিবার এসে শিকড় গেঁড়ে বসেছে। এইভাবে দু-চারজন আমাকে ভালবেসে আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইতো না। অগত্যা ঢালাও বাজার, ঢালাও রান্না, ঢালাও বেড়ানো, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার বিশ্রাম আর হয় নি। আমি যদি তখনই আপত্তি করতাম আজ আর এই দুর্ভোগগুলি ঘটতো না। অবশ্য তার মধ্যে সব আত্মীয়তা বৃথা যায় নি। শ্রীপ্রীতিকুমার চলে গেলেও তাঁর প্রিয়জনেরা আমার সমস্তরকম দুঃখ কষ্টের দিকে সতর্ক নজর রাখেন। আর এই রাখেন বলেই আমি এখনও বেঁচে আছি।

আমার পুত্র বড় হবার আগেই যা ঘটনা ঘটতে লাগল তাতে আমাদের সংসারে বিপর্যয় নেমে এল। কত পরিবার যে আত্মীয়তা করতে চাইল তার ঠিক নেই। সেই যন্ত্রণায় আমি এখনও ভুগছি।

DO NOT COPY

আমার পুত্র পার্থসারথি সম্পাদনা করেন। লেখা তার মনের মতো না হলে বাদ চলে যাবে। কিন্তু সত্য কথা সব সময় মনের মতো হয়না। এইসব ঘটনার কিছু কিছু শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে আলোচনা হয়েছে। এখন আর সেসব কথা তুলে লাভ নেই। শুধু অপেক্ষা!

এইবার আসি আর একজন মহিলার কথায়। তিনি ছিলেন মারাত্মক ভাবে অসুস্থ। রোগটি ফুসফুসেরও হতে পারে, মগজেরও হতে পারে। বিরাট বড়লোকের ঘরণী। শুনেছিলাম তাঁকে দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসা করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। Cottage ঠিক করা হয়ে গেছিল, শ্রীপ্রীতিকুমারের কৃপায় তিনি সুস্থ হয়ে গেছিলেন। তারপর প্রায়ই আমাদের কাছে আসতেন। কিন্তু আমাদের সামান্য অবস্থার জন্য কিনা জানি না, তিনি আমাদের বাড়িতে ঢুকতেন না প্রথম প্রথম। বিশাল এক গাড়ি করে আসতেন স্বামীর সঙ্গে। সবচেয়ে বেশি যে কাজটি আমাকে পীড়া দিত, তা হল, ট্রে করে চা নিয়ে আমাকে গাড়িতে দিয়ে আসতে হত। ব্যাপারটা আমার খুব অপছন্দ ছিল, কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমারের মুখ চেয়ে আমি সেটা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা ছিলেন অসম্ভব বিনয়ী ও মধুরভাষিনী। কি সুন্দর করে আস্তে আস্তে কথা বলতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। তাঁর স্বামীও আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমাদের সুখে থাকার জন্য অনেক চেষ্টা করতেন। ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে আমাদের বাড়ির মধ্যে আসতে থাকলেন। আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগতো, তা হল ভদ্রমহিলার ব্যবহার। কি দামী দামী শাড়ী পরে আসতেন, হাতে থাকতো রূপোর পানের ডিবে। জর্দ্দার গন্ধ ঘর মাতিয়ে দিত। শাড়ীতে সুন্দর একটা খসখস শব্দ হত। সবচেয়ে ভালো লাগতো যখন মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞেস করতেন, "দিদি, আমি কোন কাজ করে দেবো?" আমার খুব ভালো লাগতো। হাসিও পেতো। শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রতি তাঁর ছিল অসম্ভব ভক্তি। এখনও তিনি আমার সাথে সম্পর্ক রেখে চলেন।

সবচেয়ে মজা হল ওঁদের দুজনকে খুব সুখী যুগল মনে হত। শ্রীপ্রীতিকুমারও আমার কাছে কারও image নষ্ট করতেন না।

DO NOT COPY

একদিন আমি কলেজে যাচ্ছিলাম। তখন আমি বি.টি. পড়ি। বাপী ছোট থাকবার জন্য আমি hostel-এ থাকতাম না। সকালে একটি School-এ চাকরী করতাম। দুপুরে সুদূর আলীপুর হেষ্টিংস হাউসে যেতাম বি.টি. পড়তে। শ্যামবাজার খালধার থেকে তিন নম্বর ডবল ডেকারে হেষ্টিংস হাউসে যেতাম। একদিন জগুবাবুর বাজারে হঠাৎ সেই বিশাল গাড়িটা দেখলাম। অতি আগ্রহে মুখ বাড়িয়ে দেখছি আমার সেই প্রিয় ভদ্রমহিলাকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু দেখলাম ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব ফ্যাশনেবল অন্য এক ভদ্রমহিলা। খুব ভালো করে দেখলাম। তখন ২৩/ ২৪ বছর বয়স। কৌতূহল বেশী, সংযম কম, আবেগে ছটফট করে উঠতাম। বাড়ি এসে শ্রীপ্রীতিকুমারকে বললাম। তিনি একদম চুপ। কিন্তু আমিও তো ভুল দেখিনি। আমি সোজা স্ত্রীকে টেলিফোন করে ভদ্রলোকের সাথে কোন বান্ধবী ছিলেন বলে ফেলেছি। আর যাবে কোথায়? ভদ্রমহিলার ক্ষোভের তোড়ে ভেসে গেলাম। শুনলাম তাঁর স্বামী ঐ পরস্ত্রী রোগে ভুগছেন। যেখানেই যান ঐ বান্ধবীকে নিয়ে যান। এমনকি রাঁচী হাজারীবাগের বাড়িতেও নিয়ে যান। সেখানকার দারোয়ান ও কাজের লোকেরা পর্য্যন্ত ওদের স্বামী স্ত্রী বলে জানেন। আমার এত মন খারাপ হয়ে গেল বলবার নয়। যাদের আমি এত পছন্দ করি তাঁদের জীবনে কি সমস্যা! শ্রীপ্রীতিকুমার দেখলেন যখন আমি সব জেনে ফেলেছি আমাকে নীরব থাকার নির্দ্দেশ দিলেন। তাঁর সে কথা আমি পালন করেছিলাম। ভদ্রমহিলা তারপর থেকে আমাদের বাড়িতে আসা কমিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী দিন দিন মদে ডুবে যেতে থাকলেন। স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের প্রতি কোনও কর্তব্য করতে পারতেন না। পরে শ্রীপ্রীতিকুমার তাদের ভালো রাখবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। মহিলাকে তিনি 'দিদি' বলে ডাকতেন এবং তার ছেলে যাতে ভালো থাকে সে আশীর্বাদও করেছিলেন। ভদ্রলোকের দুশ্চরিত্রপনায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে সুপথে ফেরাতে পারেন নি। ফলে তার সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। ভদ্রলোকের কিন্তু কোনও পরিবর্তন হয়নি। ক্রমশঃ নিঃস্ব হতে থাকলেন। শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে চরম শত্রুতা করেছিলেন। তিনি একজন তান্ত্রিককে নিযুক্ত করেছিলেন শ্রীপ্রীতিকুমারের মৃত্যুর জন্য। শ্রীপ্রীতিকুমার সে খবর

পেয়েছিলেন। শুধু হাসতেন। ১৯৮৬ সালের ১লা নভেম্বর সোফায় বসে হেসে বললেন, "আমাকে মারবার চেষ্টা করা হচ্ছে।" আমি এখনও বিশ্বাস করিনা কেউ তাঁকে মারবার চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেছে। আমার বিশ্বাস আমার জীবনে প্রচণ্ড বিপর্যয় আসছিল, তিনি আমাকে রক্ষা করে গেলেন। বিপদ আমাদের অনেক এসেছে, সমস্যায় আমরা জর্জরিত, কিন্তু সব কিছু কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করি।

সেই ভদ্রলোকের নাম আমি মুখে আনি না, কিন্তু ভদ্রমহিলা আমার সাথে যোগাযোগ রাখেন, চিঠি লেখেন। আমার খুব ভালো লাগে যখন লেখেন তাঁর ছেলেকে আশীর্বাদ করার জন্য। ছেলেটিকে আমিও খুব স্নেহ করি। শ্রীপ্রীতিকুমার ছেলেটিকে যেদিন শেষ দেখেন, বলেছিলেন, "তোমার মা-কে বোল আমি যদি এ' পৃথিবীতে নাও থাকি তাহলেও তাঁর কোন অসুবিধা হবে না।" – সে অসুবিধা তার হয়নি। অন্ততঃ ছেলেটি মায়ের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করে। শ্রীপ্রীতিকুমারকে তারা ভোলেনি। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার চেষ্টা করে।

- - - - - - - - -

(** রচনাকাল – জানুয়ারি, ১৯৯১)

"ভগবান হলেন পরিপূর্ণ পূর্ণতা,
সকল অস্তিত্বের অনন্ত উৎস।
তাঁর সম্বন্ধে আমরা ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠি;
তাঁতেই পরিণত হয়ে চলি অনন্তকাল ধরে।"

---------- **শ্রীমা**

DO NOT COPY

ভারতের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সাধক দয়ালদাস বাবার নাম অনেকের কাছে পরিচিত। তিনি ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে অন্যতম।

বাবাজীর অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপজী গুরু প্রসঙ্গে লিখেছেন, "তিনি নামেও যেমন দয়াল ছিলেন, কার্য্যেও তিনি তেমনি দয়াল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিকট কোন দীনদুঃখী গমন করিলে তিনি তাহাকে ভোজন না করাইয়া যাইতে দিতেন না। কৌপীন কমণ্ডলু মাত্র সম্বল লইয়া অবধূত দয়ালদাস আগন্তুক অভুক্ত ব্যক্তি মাত্রকেই অন্ন দিতেছেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল। গৃহস্থ সকল তাঁহার বৈরাগ্য ও বদান্যতায় মুগ্ধ হইয়া সাধু ও দরিদ্র সেবার জন্য আটা, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাঠাইতে লাগিল। তিনিও দুই হাতে দান করিয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যান সেইখানেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার এইরূপ উন্মুক্ত হইতে লাগিল। ..... "

অন্যান্য সাধক সিদ্ধ পুরুষদের মত মহাসাধক পরমহংস দয়ালদাস বাবার অলৌকিক বিভূতি ছিল অসীম।

সেবার দয়ালদাস বাবা ভক্ত ও সাধুসন্তদের দলপতিরূপে চলেছেন গঙ্গাসাগর তীর্থে। এই তীর্থে প্রতি বছরই ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে বহু পুণ্যার্থী ও সাধুসন্তদের ভীড় হয়। তাঁদের ধারণা, এই সাগর সঙ্গমে একবার অবগাহন করতে পারলে তার পুণ্যধন মারে কে? এই কারণে বলেছে, 'অন্য তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার।'

বিহারের মধ্য দিয়ে আসার সময় বাবাজী মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে ছাউনি ফেললেন। দেখতে দেখতে তাঁদের ঘিরে বিরাট জনতার সমাবেশ হল। বহু ব্যবসায়ী নানা ভোগ্য পণ্য নিয়ে এগিয়ে এলেন সাধুসন্তদের সেবার জন্যে।

তখন পৌষ মাস। ওখানে প্রচণ্ড শীত। তবু গভীর রাতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ধুনি জ্বালিয়ে সাধুসন্তরা আপনার মনে ধ্যান জপ করে চলেছেন। ঐ শীতে

তাঁদের নির্বিকার থাকতে দেখে অবাক হন সংসারীরা।

একদিন এক গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করলেন দয়ালদাস বাবাজীকে, বাবা, এই দুঃসহ শীতের রাতে আমরা ঘরের ভেতর কাঁপতে থাকি। আর আপনারা থাকেন কিভাবে?

উত্তরে দয়ালদাসজী বললেন, ঘুম না হলেই বা ক্ষতি কি? সাধুদের একমাত্র কাজ হচ্ছে সাধন ভজন নিয়ে থাকা। যেদিন শীতের দাপটে ঘুম হয় না, সেদিন মনোযোগ দিই গভীর সাধন ভজনে। এর জন্যে তুমি আদৌ চিন্তা করো না।

এরপর তিনি আনন্দ সহকারে বেদান্তের আলোচনায় মন দিলেন।

সেদিন রাতে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল। দলের কোন কোন সাধকের মুখে প্রকাশ পেল উদ্বেগের চিহ্ন। তাঁরা দয়ালদাসজীর কাছে এসে অনুযোগ করলেন, তাই তো, এখন জলে চারদিক ভিজে গেল। ধুনির জন্য শুকনো কাঠ যোগাড় করা যাবে কিভাবে?

তাঁদের কথা শুনে সামান্য হাসলেন দয়ালদাসজী। তারপর ধীরভাবে বলতে লাগলেন, দ্যাখো, সাধুদের বোঝা বয়ে থাকেন ভগবান। এর জন্যে তোমরা অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তোমাদের ভোজনের জন্যে ধনী ব্যবসায়ীরা নানা রকম ভোজ্য দ্রব্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কত দরিদ্র লোকও এসেছে তোমাদের সেবার জন্যে। একটু দেরি কর, একজন কাঠুরে এক বোঝা কাঠ নিয়ে আসছে। যত খুশী ধুনি জ্বালাও, আর সারারাত ধ্যানজপ কর।

কিছুক্ষণের মধ্যে দয়ালদাসজীর কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। একটি কাঠুরে মাথায় একবোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। কাঠের বোঝাটি বাবাজীর সামনে রেখে যুক্ত করে বলতে লাগলো, বাবা, আমি অতি দরিদ্র। ছা-পোষা মানুষ। বন থেকে কাঠ কেটে তাই বিক্রি করে কোন রকমে সংসার চালাই। ঘরে কিছু কাঠ ছিল। তাই আপনার সেবার জন্যে নিয়ে এলাম।

বাবাজী আনন্দ সহকারে কাঠুরিয়ার শুকনো কাঠের বোঝা গ্রহণ করলেন। পরে বাবাজী ঐ কাঠওয়ালাকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য প্রদানে তুষ্ট করে বিদায় দিলেন।

দয়ালদাস বাবাজীর অলৌকিক বিভূতির যেন শেষ নেই। দিনের পর দিন তিনি ভক্ত ও আশ্রিতদের নানা ভাবে কৃপা করে চলেছেন।

সেদিন বেশ রাত। দয়ালদাস বাবা ধুনি জ্বেলে ভক্তদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় তন্ময় হয়ে আছেন। এমন সময় একজন হিন্দুস্থানী ভক্ত বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত হল। রাত গভীর হয়েছে। তার বাড়িতে রান্না করার লোক নেই। বাড়ি গিয়ে রাঁধতে হবে। তাই সে বাবার কাছে বাড়ি যাবার অনুমতি প্রার্থনা করার অবসর খুঁজছে।

দয়ালদাস বাবাজী তন্ময় চিত্তে ধর্মোপদেশ দিয়ে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো ঐ হিন্দুস্থানী ভক্তটির দিকে। তিনি তার দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, আরে তুমি দেখছি ঘরে গিয়ে রসুই করার জন্যে ব্যস্ত হয়েছো। এখানে ভগবানের কথা শুনছো। তাই ভগবানই তোমার সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ঘরে ফিরেই দেখবে খাবার তৈরি।

ভক্তটি বাবাজীর কথা শুনে আর বাড়ি ফেরার জন্যে উদগ্রীব হল না। আগের মতই শান্ত মনে বাবাজীর কাছ থেকে ধর্মকথা শুনতে লাগলো।

মাঝরাতে ভক্তটি বাড়ি ফিরে গেলো। সেখানে গিয়ে দেখলো, একজন আত্মীয় তার ঘরে অতিথি হয়েছে। গৃহকর্তার ফিরতে দেরি দেখে নিজেই রুটি সব্জি তৈরি করে তার অপেক্ষায় বসে আছে। ভক্তটি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেই তৈরি খাদ্য গ্রহণ করলো। মনে মনে দয়ালদাস বাবার অশেষ গুণ কীর্তন করতে লাগলো।

মুঙ্গেরে এক নদীর ঘাটে অবস্থান করছেন দয়ালদাস বাবাজী। তাঁর ছাউনিতে ত্যাগী ও গৃহী নানা জাতের মানুষ এসে জমায়েত হয়েছে। সকলে বাবার মুখে কৃষ্ণকথা শুনছে প্রাণ-মন দিয়ে। শহরের এক নামী ভদ্রলোক সেদিন চলে এলেন বাবাজীর কাছে। তাঁর এক পরমাত্মীয় দূর দেশে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। চিঠি এসেছে, ডাক্তাররা জবাব দিয়েছেন। যে কোনও মুহূর্তে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে পারে।

DO NOT COPY

ভদ্রলোক শুনেছেন দয়ালদাস বাবার অপরূপ যোগৈশ্বর্যের কথা। তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন। তাই তিনি দয়ালদাস বাবার কাছে এসেছেন তাঁর কৃপা লাভের জন্যে। তাঁর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ে জানালেন প্রাণের কথা। সেই সঙ্গে অঝোরে অশ্রুজল বিসর্জন করতে লাগলেন।

দয়ালদাসজী তাঁকে শান্ত করে বললেন, কেঁদো না বৎস। কেঁদে কোন লাভ হবে না। তোমার সেই আত্মীয়টি আর বেঁচে নেই। ঘন্টাখানেক আগে তার প্রাণবিয়োগ হয়েছে।

ঐ কথা শোনামাত্র ভদ্রলোক ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তখন দয়ালদাস বাবা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, অমন করে কেঁদো না। মানুষ চিরকাল বাঁচে না। তাঁর নশ্বর দেহ চিরদিন থাকেনা এই পৃথিবীতে। একদিন না একদিন তা চলে যাবে। এ দেহ যে অনিত্য। সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু। তুমি তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন কর। দেখবে তোমার শোক-দুঃখ সব কিছু চলে যাবে।

এই কথা বলে বাবাজী ঐ আগন্তুক ভদ্রলোকের মাথায় করস্পর্শ করলেন।

দেখতে দেখতে ভদ্রলোক প্রাণের মধ্যে অনুভব করলেন এক অপূর্ব ও অনাস্বাদিত নির্মল আনন্দ। ক্ষণকালের জন্যে তাঁর মন নিত্যানন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো। একটু আগে তিনি প্রাণের মধ্যে যে আত্মীয়বিয়োগ ব্যথা বোধ করছিলেন, এখন আর তা নেই।

"নর যদি রাখে নারীকে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!
যুগের ধর্ম এই –
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।"

-------- কাজী নজরুল ইসলাম

DO NOT COPY

অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী হলেন ভক্তিবাদী **ডাঃ রুহিদাস সাহা**

পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৃহী অদ্বৈতবাদীরূপে উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের ভারতময় যেমন খ্যাতি ছিল, সন্ন্যাসী অদ্বৈতবাদীরূপে তেমনই ভারতময় খ্যাতি ছিল কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতীর। 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' নামক গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ প্রকাশানন্দেরই রচিত। এই গ্রন্থ অনুসারে তিনি ছিলেন জ্ঞানানন্দের শিষ্য। এই গ্রন্থ তাঁর যে পরিচয় বহন করে তা হল তাঁর দাম্ভিকতা। প্রকৃতপক্ষে দাম্ভিক প্রকৃতির বৈদান্তিকই ছিলেন প্রকাশানন্দ।

চৌদ্দশত ছত্রিশ শকাব্দের শেষের দিকে প্রকাশানন্দের আবাসভূমিতে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন ঘটে। সেখানে তিনি দুই মাসাধিক কাল অতিবাহিত করেন।

মধ্যযুগে কাশীর পরিচিতি জ্ঞানবাদের পীঠস্থান রূপে। আর নবদ্বীপ তখন ভারতের দ্বিতীয় বারাণসী। তাই তখন নবদ্বীপের সঙ্গে কাশীর একটি ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। সেই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব, বৈদান্তিক অদ্বৈত আচার্য্যের শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, সমগ্র বঙ্গভূমিতে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি-ধর্মের প্লাবন – এরূপ প্রতিটি ঘটনার কথা প্রকাশানন্দের অজানা থাকবার কথা নয়। এ'সব ঘটনায় ব্যথিতই হয়েছিলেন প্রকাশানন্দ। তাঁর অদ্বৈত-বাদী বন্ধু বাসুদেব সার্বভৌমের জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন শ্রীচৈতন্য। পাণ্ডিত্যের অহমিকা থেকে মুক্ত করে তাঁকে তিনি দীক্ষিত করেছেন ভক্তিবাদে। অদ্বৈতবাদের স্তম্ভগুলি একে একে লুটিয়ে পড়ছে শ্রীচৈতন্য-চরণে। এসব ঘটনায় ব্যথিত হয়েছেন প্রকাশানন্দ, হয়েছেন বিরক্ত, হয়েছেন ক্রোধান্বিত। এসব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু যিনি সেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি

স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত ছিলেন তিনি। সেই শ্রীচৈতন্যদেবের কাশীতে আগমনে যখন লোকারণ্য সৃষ্টি হল, দলে দলে মানুষ সৌম্যকান্তি যুব সন্ন্যাসী দর্শন করতে যখন ব্যাকুল তখন প্রকাশানন্দ নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর সেই বিরক্তি, তাঁর সেই চারিত্রিক দাম্ভিকতা। শ্রীচৈতন্যও প্রকাশানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান নি। এতেও প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। কাশীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন-বার্ত্তা শুনে তাই তিনি শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বলে বেড়াতে লাগলেন – শ্রীচৈতন্য নামে মাত্র সন্ন্যাসী, ভাবুক লোক, প্রতারক।

প্রকাশানন্দের মুখে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে এরূপ নিন্দাপূর্ণ উক্তি শুনে তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর বৈদ্য ও পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়ার মত কাশীবাসী ভক্তগণ প্রাণে দারুণ আঘাত পেলেন। তাঁরা একদিন সেকথা শ্রীচৈতন্যকে জানালেন। বললেন, "তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ। শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ।" শ্রীচৈতন্য তাঁদের হৃদয়-সর্বস্ব, তাঁদের প্রাণের ঠাকুর। সেই প্রাণের ঠাকুরের সম্পর্কে প্রকাশানন্দের কুৎসা-রটনায় তাঁরা বিচলিত হলেন, এসব বন্ধ না হলে আত্মহত্যারও সঙ্কল্প করলেন।

ভক্তদের কাতরতায় বিচলিত হলেন না শ্রীচৈতন্য। ব্যথিত হলেন না। বরং তিনি স্মিত হাসি হাসলেন। ভক্তদের বিচলিত হতে নিষেধ করলেন।

কাশীতে শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করেই এক মহারাষ্ট্রবাসী তাঁর ভক্তে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, মহাপ্রভুর দর্শনে তিনি পরমানন্দ লাভ করেছিলেন। সেই পরমানন্দে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকেও অবগাহন করিয়ে আনন্দ দিতে তাঁর প্রবল ইচ্ছা হল। অনেকদিনই তিনি প্রকাশানন্দের কাছে যেতেন। সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষাতেই একদিন তিনি প্রকাশানন্দের কাছে শ্রীচৈতন্য প্রশস্তি গাইলেন। বললেন, "এক

সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে। তাঁহার মহিমা-প্রভাব না পারি বর্ণিতে।। প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চনবরণ। আজানুলম্বিতভুজ কমল নয়ন।। যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব-সুলক্ষণ। সকল দেখিয়া তাতে অদ্ভুত কথন।" শ্রীচৈতন্যকে তাঁর কাছে কি মনে হয়েছে সে কথাও বললেন – "তাঁহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ।"

শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে প্রকাশানন্দ খুবই বিরক্ত। সেই শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে এ ভাষায় প্রশস্তি শুনে প্রকাশানন্দ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সেই সঙ্গে বিদ্রূপের হাসিও হাসলেন প্রকাশানন্দ, উপহাস করে বললেন –"হ্যাঁ, শুনেছি গৌড়দেশ থেকে এক ভাবুক সন্ন্যাসী এসেছে। সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেও প্রকৃতপক্ষে সে সন্ন্যাসী নয়, লোক প্রতারক। যে দেখে সেই তাঁকে ঈশ্বর বলে মনে করে এটা তাঁর মোহন বিদ্যা। সে নামে মাত্র সন্ন্যাসী, আসলে ঐন্দ্রজালিক।" আত্মতৃপ্তির সঙ্গে প্রকাশানন্দ যোগ করলেন, "চৈতন্য যেখানে যা করুক না কেন, তার ভাবকালী কিন্তু বিকোবে না এখানে।"

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র ইতিমধ্যেই শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তে রূপান্তরিত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পথ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে প্রকাশানন্দ তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "তুমি চৈতন্যের সান্নিধ্যে যেওনা, ওসব ব্যক্তির সান্নিধ্যে গেলে ধর্মনাশ হয়। তুমি আমার কাছে প্রতিনিয়ত বেদান্ত শ্রবণ কর।" প্রকাশানন্দ তো দেখেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের চিন্তাধারা সুদূর বঙ্গভূমি থেকে নীলাচল হয়ে পশ্চিম ভারতে সবকিছুকে কিভাবে পরিবর্তন করে দিয়ে যাচ্ছে, এতদিনের এতো এতো কুসংস্কারের জঞ্জাল, ঘৃণিত অস্পৃশ্যতা – চৈতন্যশক্তির প্রবাহে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এসব ত' প্রকাশানন্দ জানেন, কিন্তু স্বীকার করতে তাঁর বাধে, বুকের পাঁজরটা ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। এখন তিনি খড়কুটোকে অবলম্বন করতে চান, তাই তো মহারাষ্ট্রীয়

DO NOT COPY

বিপ্রকে এভাবে বিরত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এদিকে চৈতন্য স্রোতে যে সব ভেসে গিয়েছে, তা' অবিশ্বাস করতে তাঁর ভাল লাগে।

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র ইতিমধ্যেই চৈতন্য-স্রোতে ভেসে গিয়েছেন। তাই তিনি প্রকাশানন্দের মুখে শ্রীচৈতন্য-নিন্দা শুনে প্রাণে নিদারুণ আঘাত পেলেন। সব কথা বললেন শ্রীচৈতন্যকে। ক্রোধান্বিত হলেন না শ্রীচৈতন্য। তাঁর মুখ-মণ্ডলে কোন বিকৃতিই লক্ষ্য করা গেল না। বরং তিনি হেসে হেসে বললেন, "বেশ তো, আমার ভাবকালী যদি আমি না বেচতে পারি তবে তা' আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, না হয় অল্প মূল্যেই দিয়ে যাবো।"

প্রকাশানন্দের মুখে চৈতন্য-নিন্দা শ্রবণ করে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তাই শ্রীচৈতন্যদেবের এই পরিহাস তাঁর মনের বেদনা লাঘব করতে পারে নি। শ্রীচৈতন্য যে কি বস্তু তা তো তিনি এতোদিনে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। প্রকাশানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলে শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বভৌম ক্ষমতায় প্রকাশানন্দের মধ্যে পরিবর্তন ঘটবে এই বিশ্বাস, এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে প্রকাশ পেল। শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে তিনি সে কথা প্রকাশ করলেন। শ্রীচৈতন্য কিন্তু বিষয়টিকে এই মুহূর্তে এড়িয়ে গেলেন।

শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন চলে গেলেন। বৃন্দাবন থেকে ফিরবার পথে প্রয়াগে এলে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এখানে দশদিন অবস্থান করে শ্রীরূপ গোস্বামীকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশাদি দিয়ে তাঁকে বৃন্দাবন পাঠালেন এবং তিনি নিজে ফিরে এলেন কাশীতে। এখানে দু'মাস অবস্থান করে শ্রীচৈতন্য সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিলেন।

DO NOT COPY

শ্রীচৈতন্য কাশীতে ফিরে এলে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র তাঁর সেই পূর্ব প্রচেষ্টা আবার নতুন উদ্যমে চালালেন। এবার কিন্তু শ্রীচৈতন্য অসম্মত হলেন না। এতদিন তিনি হয়তো এই দিনক্ষণের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাইতো, শ্রীচৈতন্য স্পর্শমণির পরশে বাসুদেব সার্বভৌমের জীবনে পরিবর্তন ঘটলে সার্বভৌমের ইচ্ছা ছিল তাঁর অদ্বৈতবাদী বন্ধু প্রকাশানন্দও এমন পরিবর্তনের মাধ্যমে পরমানন্দ লাভ করুক। এই উদ্দেশ্যে নীলাচল থেকে কাশীর উদ্দেশে রওনা হতে চেয়েছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম। কিন্তু তাতে তখন সম্মতি দেন নি শ্রীচৈতন্য। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ করার ইচ্ছাতেই সম্ভবত সেদিন তিনি বিরত করেছিলেন বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে।

শ্রীচৈতন্য ও প্রকাশানন্দ উভয়কে একত্রিত করতে সশিষ্য প্রকাশানন্দকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করলেন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র। শ্রীচৈতন্য চরণে পতিত হয়ে সকাতরে তাঁকেও নিমন্ত্রণ করলেন তিনি। ভক্তের আকুলতায় শ্রীচৈতন্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সম্মত হলেন।

নির্দিষ্ট দিনে বিপ্রের গৃহে আগমন হল শ্রীচৈতন্যদেবের। তার আগেই সশিষ্য প্রকাশানন্দ পৌঁছে গিয়েছেন।

যে পাণ্ডিত্য নিয়ে নবদ্বীপে দিগ্‌বিজয়ী কেশব কাশ্মীরিকে পরাস্ত করেছিলেন শ্রীচৈতন্য, সেই পাণ্ডিত্য আর তার সঙ্গে বীর্য্যবত্তা, পৌরুষ ও সুতীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা নিয়ে প্রকাশানন্দের সঙ্গে সম্মুখ সমরে তিনি নামতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। প্রকাশানন্দের দৃষ্টিতে তিনি যেমন একজন সাধারণ মানুষ, সেইরূপ একজন সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করলেন তিনি। পাদ প্রক্ষালন করে

DO NOT COPY

কাছাকাছি একস্থানে উপবেশন করলেন তিনি। সন্ন্যাসীদের জন্য রক্ষিত আসনে তিনি বসলেন না।

শ্রীচৈতন্যের গুণকীর্ত্তন অনেক শুনেছেন প্রকাশানন্দ। লোক মুখে যাঁর এত গুণকীর্ত্তন তাঁর আচরণ হবে কতো গম্ভীর, নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তেমনই ভেবেছিলেন প্রকাশানন্দ। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যতিক্রম অবস্থা প্রত্যক্ষ করে একটু যেন কি ভাবলেন প্রকাশানন্দ। শ্রীচৈতন্যের বিনয়ী আচরণ প্রকাশানন্দের মধ্যে একটু পরিবর্তন সূচিত করলো। প্রথম দর্শনেই তাঁর নিজের দাম্ভিকতায় যেন একটু আঘাত এলো। তিনি নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, "তুমি এই হীনস্থানে বসেছ কেন? এখানে এসে বসো।"

প্রত্যুত্তরে প্রকাশানন্দের মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে শ্রীচৈতন্য বললেন, "আমি হই হীন সম্প্রদায়, তোমার সভায় বসিতে না যুরায়।"

প্রকাশানন্দের মধ্যে আরও একটু পরিবর্তনের প্রকাশ ঘটলো। তিনি নিজেই শ্রীচৈতন্যের হাত ধরে তাঁকে সভার মধ্যে এনে বসালেন। বললেন, "তুমি সন্ন্যাসী, বেদান্ত পাঠই তোমার ধর্ম। তা না করে তুমি নৃত্যগীত কর কেন? কাশীতে এসে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন?"

সবিনয়ে তারও উত্তর দিলেন শ্রীচৈতন্য। "প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ। গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন।। মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্ত বিচার। কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর এই মন্ত্র সার।।"

শ্রীচৈতন্যদেবের বিনয়ে প্রকাশানন্দের মনের দাম্ভিকতার অন্ধকার আরও অপসারিত হলো।

শ্রীচৈতন্য বলে চললেন – কৃষ্ণনামে পাগল হয়ে আমি গুরুকে জিজ্ঞাসা

করলাম তুমি আমাকে একি মন্ত্র দিলে যে আমি পাগল হয়ে গেলাম? এ মন্ত্র আমাকে নাচায়, কাঁদায়। গুরু তখন বললেন – কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব, কৃষ্ণনামের আনন্দ পঞ্চম পুরুষার্থ, তুলনায় মোক্ষাদির আনন্দ বিন্দু মাত্র। তাই আমি নৃত্য করি, গান করি।

শ্রীচৈতন্যের সুমধুর বাচনভঙ্গীতে প্রকাশানন্দের মধ্যে আরও পরিবর্তন সূচিত হলো। তিনি কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন – "বেদান্ত শ্রবণে দোষ কোথায়? তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর না কেন?"

সে প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন শ্রীচৈতন্য। সহাস্যে বললেন, "যদি মনে কোনও বেদনা অনুভব না কর তবে বলি কেন আমি বেদান্ত শুনিনা।" বলেই ধীরে ধীরে তিনি শংকরাচার্যের মায়াবাদ ভাষ্যের দোষ দেখালেন। শ্রীপাদ শংকরের ভাষ্যে নানা দোষের উদ্ভব হওয়ার কারণ তিনি শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাগ করে গৌণী বৃত্তিতে অর্থ করেছেন, সে কথাও বললেন। শ্রীশংকরের বিবর্তনবাদ খণ্ডন করে পরিণামবাদ স্থাপন করলেন। ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব নিরাকারত্ব খণ্ডন করে সবিশেষ সাকারত্ব স্থাপন করলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাখ্যায় সশিষ্য প্রকাশানন্দ মুগ্ধ হলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁরা মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন।

এর কিছুদিন পর একদিন সশিষ্য প্রকাশানন্দ তাঁর আশ্রমে বসে শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা তখন সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারলেন, শ্রীচৈতন্য সূত্রের যে অর্থ করেছেন তাই বেদান্ত সূত্রের বাস্তব অর্থ। এরূপ আলোচনা যখন চলছিল একদিন ঠিক সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য স্নান শেষে বিন্দুমাধব দর্শনে গিয়েছেন। সেখানে প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভাবসমাধি-মগ্ন হলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর বৈদ্য, সনাতন গোস্বামী। তাঁরা মহাপ্রভুর ভাব-

সমাধি দর্শন করে নাম কীর্ত্তন শুরু করলেন। শত শত লোক কীর্ত্তনে অংশগ্রহণ করলো। সংকীর্তনের উচ্চরোল আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনি তুললো। নিকটেই ছিল প্রকাশানন্দের আশ্রম। সংকীর্ত্তন ধ্বনি শুনে শিষ্যদের নিয়ে তিনি ছুটে এলেন বিন্দুমাধব মন্দিরে। সেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের যে মূর্তি তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন তাতে তিনি সীমাহীন আনন্দে অবগাহন করলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে গ্রহণ করে আত্মস্থ করে ফেললেন। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে তিনিও সংকীর্তন করতে লাগলেন। এতদিনের দাম্ভিকতা কোথায় ভেসে গেলো! তিনি হয়ে গেলেন সহজ সরল। কীর্ত্তন করতে করতে তাঁর দেহেও অশ্রুকম্প পুলকাদি প্রকাশ পেল। শ্রীচৈতন্য বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রকাশানন্দকে দুহাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্য চরণে পতিত হলেন, সাশ্রুনয়নে করজোড়ে বললেন – "বেদময় মূর্তি তুমি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষম অপরাধ পূর্বে যে কৈনু নিন্দন।" কয়েক সহস্র শিষ্যসহ প্রকাশানন্দের জীবনে চরম পরিবর্তন সাধিত হল। তিনি ভক্তিমার্গে উদ্ভাসিত নবজীবন লাভ করলেন।

"নর যদি রাখে নারীকে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে !
যুগের ধর্ম এই –
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।"

-------- কাজী নজরুল ইসলাম

DO NOT COPY

হ্যাঁরে ওকি? ওরকমভাবে পালিয়ে এলি কেন? শিশু সন্তানকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন মা। ছেলেটির হাতে দিয়েছিলেন সাঁঝপ্রদীপ। চণ্ডী মণ্ডপে দেখাতে হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় ওখানে প্রদীপ দিতে হয়। তাই আজও তার কোন রকম ব্যতিক্রম হল না। বালক কম্পিত স্বরে ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো, মা, আমি যেতে যেতে দেখলুম, আমার সামনে এক জায়গায় দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো। সেখানে মা দুর্গা আবির্ভূতা হয়ে আবার অদৃশ্য হলেন। মা তখন ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। তার নরম অধরে ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগলেন। মনে মনে দুর্গামাতার কাছে প্রার্থনা জানালেন, মা, আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করো। ওর মনে যেন তোমার প্রতি ভক্তি জাগে।

বাংলা ১২৮৬ সালের ঝুলন পূর্ণিমা তিথি। এই পবিত্র দিনে নদীয়া জেলার কুতুবপুর গ্রামে নলিনীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পরবর্তী জীবনে সারা ভারতে স্বামী নিগমানন্দ নামে পরিচিত।

নলিনীকান্তর পিতা ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাতা মানিকসুন্দরীও ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। বাল্যকালে নলিনীকান্ত অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। পাড়াপড়শীরা তাঁর দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে'ভাব আপনি চলে যায়। তখন তাঁর মধ্যে আস্তে আস্তে পরিবর্তন দেখা গেল। লেখাপড়ায় মন বসলো। যৌবনে ওভারসিয়ারী পাশ করে ভাল চাকরী পেলেন নিগমানন্দ। রাণী রাসমণির জমিদারীতে চাকরী। বিষয়ের কাজ। এই সময় তিনি বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুন্দরী এবং সুলক্ষণা। নাম সুধাংশুবালা।

কিন্তু তাঁর বিবাহিত জীবন বেশীদিন স্থায়ী হলো না। তিনি তখন বিদেশে। স্ত্রী দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুসময়ে নলিনীকান্ত স্ত্রীর কাছে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ছায়া মূর্তি দেখতে পান সুদূর বিদেশ থেকে। ঐ অশরীরী মূর্তি দেখে অবাক হন

নলিনীকান্ত। তিনি এসব জিনিষ বড় একটা বিশ্বাস করতেন না। আবার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মনে করলেন তাঁর স্ত্রী বেঁচে আছেন। বাড়ী গেলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন। বাড়ীতে এসে শোনেন, স্ত্রী মারা গেছেন। তখন নিগমানন্দ শোকে মুহ্যমান হন। প্রাণাধিক প্রিয় প্রিয়তমা পত্নীকে হারিয়ে তিনি নিজেকে বড় শূন্য বোধ করতে লাগলেন। কেবল তাই নয়, স্ত্রীর অশরীরী মূর্তি দেখবার জন্যে আকুল হলেন। তাঁর ঐ আকুলতা দেখে একজন বললে, কেন মিছামিছি ছায়ার পেছনে ঘুরছো। ওর চেয়ে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হলে তিনি দেখা দেবেন।

নলিনীকান্ত তখন ঘর ছেড়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ালেন। ইচ্ছা ঈশ্বর দর্শন করবেন। একাধিক যোগী পুরুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। মহামানব বামাক্ষেপার কৃপায় তিনি তারা মার দর্শনলাভ করেন। পরে বামাক্ষেপা তাঁকে কিছু যোগ শিখিয়ে দেন। ইষ্ট দর্শনের পর নলিনীকান্ত তারাপীঠ ত্যাগ করেন।

বামাক্ষেপা নলিনীকান্তকে দেখে বুঝতে পারলেন তিনি ভক্তিমার্গের সাধক নন। তাঁর মার্গ হচ্ছে জ্ঞানের। তাই তিনি তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘ওরে, তোকে শঙ্কর পন্থায় সন্ন্যাস নিতে হবে, তুই জ্ঞানপন্থী গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাস নে।’ এই আদেশমত নলিনীকান্ত ঘর ছেড়ে দিক্‌বিদিকে ঘুরে বেড়ালেন সদ্‌গুরুর আশায়।

নানা পথ ভ্রমণ করে নলিনীকান্ত এলেন আজমীড়ে। এখানে সচ্চিদানন্দ পরমহংসের সাক্ষাৎ পান। ইনি পরম বৈদান্তিক। এনার আশ্রয়ে কিছুদিন থেকে জপতপ করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে সচ্চিদানন্দ কঠোর পরীক্ষার দ্বারা নলিনীকান্তকে শুদ্ধ করে দেন। পরে তাঁকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন। দীক্ষার পর নলিনীকান্তর নাম হলো নিগমানন্দ সরস্বতী। এরপর কখনো গুরুর সঙ্গে, কখনো একাকী উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান ও মানস সরোবরের পরিক্রমা করে বেড়ালেন নিগমানন্দ।

পরে গুরুর আশ্রমে ফিরে এলে সচ্চিদানন্দ গম্ভীর স্বরে বললেন, ‘বেটা, আমার কাছে যা হবার তা তোর হয়ে গেছে। তোকে এবার যোগসিদ্ধ গুরুর কাছে

যেতে হবে। তবে তোর সাধনা পূর্ণ হবে।' গুরুর কাছ থেকে পরম আশ্বাস পেয়ে নিগমানন্দ বেড়িয়ে পড়লেন পথে যোগসিদ্ধ গুরুর অন্বেষণে। বহু পাহাড় পর্বত আর জঙ্গলময় দুর্গম পথ পরিক্রমা করে নিগমানন্দ চলে আসেন এমন এক জায়গায় যেখানে অকস্মাৎ ভাবে দেখা পান এক যোগসিদ্ধ গুরুর। এই গুরুর নাম সুমেরদাস মহারাজ। ইনি একজন পাঞ্জাবী সাধক। ইনি আগেকার জীবনে মহারাজা রণজিৎ সিংহের সভাসদ ছিলেন। ইনি নিগমানন্দকে দীর্ঘ তিন মাস ধরে যোগ সাধনার কলাকৌশল শিক্ষা দিলেন। তিন মাস পরে শিষ্যকে ডেকে বললেন, "তুমি বাংলায় ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে যোগসাধনা ও তার মাহাত্ম্য প্রচার করো।" আবার বললেন, 'রাজযোগ সাধনা করতে হলে প্রচুর ঘি দুধ খেতে হয়। তাই লোকালয়ে গিয়ে কোন গৃহস্থ ভক্তের সন্ধান করা প্রয়োজন। তার পরিচর্য্যা লাভ করে তুমি নিজের সাধন পথে অগ্রসর হতে পারবে। যাও বেটা, বাংলায় ফিরে যাও। তোমার সেখানে যোগ্য পরিচর্য্যা বা সাধন ভজনের কোন অভাব হবে না।'

গুরুর কৃপা আর আদেশমত নিগমানন্দ বাংলাদেশে মেদিনীপুরে চলে আসেন এবং জনৈক গৃহী ভক্তের সেবা লাভ করেন।

যোগীবর নিগমানন্দ দূর ও নিকটের বহু আশ্রিত ও শরণাগত ভক্তদের কৃপা করতেন। শ্রীপাঠক ইন্দোর রাজ সরকারের কর্মচারী। একবার তাঁর মনে দারুণ প্রশ্ন জাগে, কে তাঁর জীবনে পথ প্রদর্শক হবেন? কে তাঁর জীবনের সুখের সন্ধান দেবেন? নদীর ধারে বসে একদিন ভাবছেন। নিবিড়ভাবে ভেবে চলেছেন। একদিন দেখলেন, আকাশের গায়ে তিনটি শব্দ সমন্বিত কার নাম যেন ভেসে উঠলো। ভালভাবে তাকিয়ে দেখলেন; লেখা রয়েছে 'স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী।'

অশ্বিনী নামে এক যুবক ত্রিপুরায় থাকে। সঙ্গে আছে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী আর একটি শিশু পুত্র। পরিবারটি নিগমানন্দের একান্ত ভক্ত। প্রতিদিন তাঁর ছবির সামনে আরতি ও ভোগ নিবেদন করে। একদিন অশ্বিনী হঠাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। মা তখন শোকে আত্মহারা হন। মনে করলেন, যে ঠাকুরকে রোজ তিনি পুজো করেন আজ

তাঁর একি দুর্দশা! এই কি ঠাকুরের কৃপা? তিনি ঠিক করলেন, আর পুজো করবেন না। ছবিটিকে নিয়ে স্থানীয় পুকুরের জলে নিক্ষেপ করবেন। এই মনে করে যেমন ছবিটিকে নিয়ে জলে ফেলতে যাবেন অমনি পেছন দিক থেকে মধুর কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল, মা। পেছন ফিরে দেখেন গুরুদেব স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী। তিনি বৃদ্ধাকে শান্ত করে বললেন, 'চলো মা ঘরে যাই। আমিই তোমার ছেলে, আমি তোমায় মা বলে ডাকবো। তোমার অশ্বিনী আমার কাছেই আছে। এই কথা বলেই অদৃশ্য হলেন স্বামী নিগমানন্দ। বৃদ্ধা ও অশ্বিনীর বিধবা পত্নী আশ্চর্য হলেন এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। মনে মনে ভাবলেন, গুরুদেব তো তখন সুদূর মেদিনীপুরে। তিনি ত্রিপুরায় এলেন কিভাবে?

এমনই ভাবে কত লোকের কাছে কতভাবে স্বামী নিগমানন্দ নিজের যোগৈশ্বর্য প্রকাশ করেছেন।

তৃণাদপি সুনীচেন **শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত**

শ্রীভগবৎ সেবার নিমিত্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, স্মরণ, বন্দন, পাদ-সেবন, শ্রবণ, কীর্ত্তন, আত্মনিবেদন, এই নববিধা ভক্তির বিধান আছে কিন্তু কলিযুগে শ্রীশ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনই যে জীবের মুক্তির একমাত্র পথ তাহাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্মের আদর্শ। নাম কীর্ত্তনের প্রাধান্য সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিলেনঃ-

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
যাহা হইতে মিলে ব্রজে কৃষ্ণ প্রেমধন।।

এবং শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই প্রচার করিয়াছেন, যথা -

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ।।

DO NOT COPY

শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনকারীর চরিত্র কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্থির করিয়া দিলেন মাত্র একটি শ্লোকে -

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি।। শিক্ষাষ্টক তৃতীয়।

অর্থাৎ তাহাকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ হইতে হইবে, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইতে হইবে এবং নিজে সম্পূর্ণ অমানী হইয়া অপরকে প্রভূত সম্মান দিবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ইহার প্রতিটি নিজে আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন - "আপনি আচরি প্রভু অপরে শিখায়।" এই প্রসঙ্গে কাশ্মীর নিবাসী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবের সহিত তাঁহার শাস্ত্রালোচনার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ শাস্ত্রালোচনাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কি ভাবে পণ্ডিত কেশবকে বিনীত হইতে উপদেশ দিয়া কৃষ্ণ প্রেমে অনুপ্রাণিত করিলেন তাহাই এই রচনার বিষয় বস্তু।

কাশ্মীর নিবাসী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব সরস্বতীর বরপুত্র ও ভগবৎ ভক্ত কিন্তু দাম্ভিক ও বিদ্যার গর্বে গর্বিত। নবদ্বীপে পদার্পণ করিয়াই তিনি বিদ্বজন সমাজকে তাঁহার সহিত শাস্ত্রতর্কের আহ্বান জানাইলেন। পণ্ডিত কেশবের পাণ্ডিত্যের প্রসার শ্রবণে সকলেই শঙ্কিত - পাছে নবদ্বীপের বিদ্যার গৌরব ক্ষুন্ন হয় ! অবশ্য পণ্ডিত কেশবও মহাপ্রভুর (নিমাই পণ্ডিত) পাণ্ডিত্যের কথা অবগত হইয়াছেন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য উদগ্রীব। এমনই সময়ে একদিন গঙ্গাতীরে জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রিতে বিদ্যার্থীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিদ্যার প্রসঙ্গেঃ-

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে।।

পণ্ডিত কেশব নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া ঘটনাচক্রে মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিতকে দেখিবা মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু অতীব বিনীতভাবে ও মর্য্যাদা সহকারে তাঁহাকে আপ্যায়ণ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন।

DO NOT COPY

পণ্ডিত কেশব মহাপ্রভুর পরিচয় পাইয়া অতিশয় গর্বিত কণ্ঠে ও দম্ভের সহিত বলিলেন, "ও, তুমিই বুঝি নিমাই পণ্ডিত? শুনিয়াছি তুমি ব্যাকরণ পড়াও, কিন্তু উহা তো শিশু শাস্ত্র!" মহাপ্রভু নম্রভাবে ও কুণ্ঠার সহিত বলিলেন – "তাহাও তো ভালভাবে পড়াইতে পারি না, পড়াই বলিয়া অভিমান করি মাত্র, আমি বুঝাইতেও পারি না আর ছাত্ররাও বুঝিতে পারে না। আপনার মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট আমি একজন নূতন ছাত্র বই আর কিছু নহি। বরং আপনার শ্রীমুখ হইতে কিছু শাস্ত্র কথা শুনিবার সাধ হয়।" মহাপ্রভুর এইরূপ বশ্যতা স্বীকারে পণ্ডিত কেশবের দম্ভ যেন আরো বাড়িয়া গেল এবং বেশ দর্পের সহিত তিনি মহাপ্রভুকে বলিলেন – "বেশ বেশ, কোন্ বিষয় তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর?" মহাপ্রভু পুনরায় বিনীতভাবে বলিলেন-

গঙ্গার মহিমা কিছু করুন পঠন।
শুনিয়া সবার পাপ হউক বিমোচন।। চৈঃ ভাঃ

মহাপ্রভুর উক্তি শেষ হইবা মাত্র পণ্ডিত কেশব ঝড় হইতেও দ্রুত বেগে গঙ্গার মহিমা বিষয়ক শ্লোকাদি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কত রূপে যে বলিতে লাগিলেন তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না, যথা -

দ্রুত যে লাগিল বিপ্র করিতে বর্ণনা।
কতরূপে বলে তার কে কহিবে সীমা।। চৈঃ ভাঃ

পণ্ডিত কেশবের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দক্ষতায় সকলেই জয়জয়কার করিতে লাগিলেন এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহারই নিকট হইতে বর্ণিত শ্লোকাদির অর্থ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন-

শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর।।
তবে যদি শ্লোকের অর্থ কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোক তবে পাইব বড় সুখে।। চৈঃ চঃ

DO NOT COPY

মহাপ্রভুর বদান্যতায় দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ নির্দিষ্ট শ্লোকের ব্যাখ্যা তিনি শুনিতে চাহেন। মহাপ্রভু নির্দিষ্ট শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যখ্যা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর নিকট হইতে নির্দিষ্ট শ্লোকটি শুনিয়া পণ্ডিত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি করিয়া তিনি তাঁহার (কেশবের) ঝড় অপেক্ষা দ্রুতবেগে বর্ণিত শত শত শ্লোকের মধ্যে একটি কণ্ঠস্থ করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন দেব বরে কেহ কবি হয় আবার কেহ বা শ্রুতিধর হয় -

প্রভু কহে দেব বরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহো হয় শ্রুতিধর।। চৈঃ চঃ

নির্দিষ্ট শ্লোকটির ব্যাখ্যা শেষ হইলে মহাপ্রভু পণ্ডিত কেশবকে ঐ শ্লোকের দোষ গুণ বিচার করিতে অনুরোধ জানাইলেন। পণ্ডিত বলিলেন তাঁহার বর্ণিত শ্লোকে দোষ তো নাই-ই, দোষের আভাষ - ক্ষীণ ছায়াও নাই, বরং উপমালঙ্কারাদি গুণ আছে এবং কিছু অনুপ্রাসও আছে। তিনি ঔদ্ধত্যের সহিত আবার বলিলেন-"আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই বেদের সার – উহাতে কোনরূপ দোষ নাই আর থাকিতে পারে না।" অতঃপর দিগ্বিজয়ীর অনুমতিক্রমে মহাপ্রভু শ্লোকের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে শ্লোকের অপূর্ব বিশ্লেষণ ও বিচার শ্রবণ করিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এতই বিস্মিত হইলেন যে তাঁহার বাকশক্তি প্রায় রোধ হইয়া গেল, যথা-

শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী প্রতিভা স্তম্ভিত।। চৈঃ চঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিত কেশবের অসাধারণ পান্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরদিবস পুনরায় শাস্ত্র বিচারে মিলিত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার আহার ও বিশ্রামের সুব্যবস্থা করিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন-

DO NOT COPY

তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গা জলধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর।।
আজ বাসা যাই কাল মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার।। চৈঃ চঃ

পণ্ডিত কেশব বাসায় ফিরিলেন বটে কিন্তু আহারাদি না করিয়া মুহ্যমান ও ভগ্ন হৃদয়ে নিজের পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুমান করিলেন যে দেবী সরস্বতীর নিকট হয়ত বা কোন অপরাধ ঘটিয়াছে যাহার মূলে এই পরাজয়। অতঃপর তিনি সরস্বতী দেবীর ধ্যান করিতে করিতে শয়ন করিলেন। স্বপ্নে সরস্বতী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে পণ্ডিত বলিলেন - "মাগো! তুমি তো বর দিয়াছ যে সর্বদাই আমার জিহ্বার অগ্রে থাকিবে, তবে আমার মুখ হইতে অশুদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করাইলে কেন?" সরস্বতী বলিলেন,-"তুমি যাঁহার সহিত শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ – স্বয়ং ভগবান। আমি তাঁর পাদ-পদ্মে নিরন্তর দাসী - তাঁহার সম্মুখে আসিতে লজ্জাবোধ করি ও আমার বাক্য স্ফুরণ হয় না। তুমি শীঘ্র যাইয়া তাঁহার নিকট আত্ম সমর্পণ কর।"
যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে -

সরস্বতী বলেন ওহে শুন বিপ্রবর।
বেদসোপ্য কহি এই তোমার গোচর।।
যাঁর ঠাঁই হৈলা তোমার পরাজয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ জানিবে নিশ্চয়।।
আমি তাঁর পাদ-পদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনাকে লজ্জাবাসী।।
যাও শীঘ্র বিপ্র তুমি উঁহার চরণে।
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে।।

দেবী সরস্বতীর স্বপ্নাদিষ্ট উপদেশ হইতে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জানিতে পারিলেন এবং প্রাতঃকাল হইবা মাত্রই

DO NOT COPY

তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন ও বলিলেন -

শুন দ্বিজবর তুমি মহা ভাগ্যবান।
সরস্বতী যাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান।।
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে।।
অতএব, বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্বভূতে দয়া করি।। চৈঃ ভাঃ

মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পাইবা মাত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দেহে প্রেম ও ভক্তির সঞ্চার হইল এবং তৃণ হইতেও অধিক নম্র হইয়া তিনি কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইলেন-

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈলা অধিষ্ঠান।।
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী দম্ভ।
তৃণ হইতে অধিক হৈলা বিপ্র নম্র।। চৈঃ ভাঃ

এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের মহাভাগ্যের প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলিলেন-

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ।।

মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ও দিগ্বিজয়ী পন্ডিতের মধ্যে শাস্ত্রালোচনা উপলক্ষ মাত্র। বস্তুতঃ পণ্ডিত কেশবের মনে "তৃণাদপি সুনীচেন"-এর প্রভাব বিস্তার ও তাঁহাকে কৃষ্ণ প্রেম দান করাই মহাপ্রভুর মুখ্য উদ্দেশ ছিল।

DO NOT COPY

যদি তুমি থাক **শ্রীলা মৈত্র**

ভেবেছিলাম শুকিয়ে গেছে
ফল্গু ধারা
বন্ধ খাঁচায় মাথা কুটে কুটে সারা
এমন সময় আলোর ঝলক
দ্বার খুলে গেল চোখের পলক
বাহিরে এসে দেখি সব ঠিক আছে
আলোয় ভুবন ভরা
আকাশের রঙ তেমনই নীল
ডানা মেলে দেওয়া মুক্ত পাখীর
আনন্দ গান আছে
সব ঠিক থাকে যদি তুমি থাক
অতি কাছে।

হাঁটতে হাঁটতে একদিন **সুনন্দন ঘোষ**

এখন কি আর মনে আছে
কবে হাঁটতে শুরু করেছিলাম আর পাঁচটা শিশুর মত
টলমল --- ধুপধাপ --- !
সেই থেকে আজও --- কখনও পেটের খিদেয়, কখনও চোখের .....
এক ছটাক রোদ্দুর, এক চিলতে নদী, এক ফালি চাঁদ --
ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষাকে ছোঁয়া .....
হেঁটেই চলেছি।

DO NOT COPY

একদিন পৌঁছব এক সবুজ প্রান্তরে,
সেখানে - রোদ ঝড় কুয়াশায় চাকরি চুরি
হয়ে যাওয়া ছেলে-মেয়েরা কর্তব্যপথে ---- নেই;
হস্টেলের তিন তলার বারান্দা থেকে
ফুটপাথে ঝাঁপিয়ে পড়া গ্রামের ছেলেটা --- নেই,
পাড়ায় পাড়ায় গুলিবিদ্ধ অর্ধদগ্ধ লাশ ---- নেই।
নেইগুলোই প্রাপ্তি সেখানে,

"জরা"-র তীরেতে বিদ্ধ এক চিরযুবক
সময়ের জলস্রোত পাড়ি দিয়ে
কৃষ্ণ থেকে কল্কি – বুদ্ধ থেকে খ্রীষ্ট ---
রূপান্তরের খেলায় মেতে আছে।

সে আমার নবজন্মভুমি ---
পুরনো ঈশ্বরকে বুকে নিয়ে নতুন জগৎ গড়ার ---
আকাশ আর সাগরের মিলন রেখায়।

DO NOT COPY